بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৮ মার্চ, ২০২২ মোতাবেক ১৮ আমান, ১৪০১ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর জীবনচরিতের আলোচনায় যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের বিষয়ে তার ধ্যানধারণা এবং তাদের সাথে তার ব্যবহার সম্পর্কে উল্লেখ করা হচ্ছিল। এ বিষয়ে ইতিহাসগ্রন্থ তাবারিতে যে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় তা হলো, কতিপয় ব্যক্তি ছাড়া আসাদ ও গাতফান এবং তার গোত্রের সকল লোক নবুয়্যতের মিথ্যাদাবিদার তুলায়হা বিন খুয়ায়লেদের হাতে একত্র হয়ে যায়। আসাদ গোত্রের লোকেরা সামীরা নামক স্থানে সমবেত হয়। আদ জাতির এক ব্যক্তির নামে এই জায়গার নাম সামীরা রাখা হয়েছে, যা মক্কা যাওয়ার পথে অবস্থিত। এই অঞ্চলের আশপাশে কৃষ্ণবর্ণের পাহাড় রয়েছে, এই নামকরণের এটিও এটি কারণ। ফাযারা এবং গাতফান গোত্রের লোকেরা নিজেদের সমর্থকদের সাথে তিবার দক্ষিণে জমায়েত হয়। তায় গোত্রের লোকেরা নিজ অঞ্চলের সীমান্তে সমবেত হয়। সা'লাবা বিন সা'দ, মুর্‌রা এবং আবাস গোত্র হতে তাদের সমর্থকরা রাবাযার আবরাক নামক স্থানে সমবেত হয়। রাবাযাও মদিনা থেকে তিন দিনের দূরত্বে অবস্থিত মদিনার উপত্যকাগুলোর মাঝে একটি উপত্যকা। আবরাকুয্ যাবাদাহ জায়গাটি বনু যুবইয়ান গোত্রের স্থানগুলোর অন্তর্গত ছিল। বনু কিনানার কিছু লোকও এদের সাথে এসে যুক্ত হয়, কিন্তু সেই এলাকায় তাদের সংকুলান সম্ভব হয় নি, যে কারণে তারা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি দল আবরাকে অবস্থান করে আর অপরটি যুল কাস্‌সায় চলে যায়। যুল কাস্‌সাও মদিনা থেকে ৪০ মাইল দূরে অবস্থিত একটি জায়গা। তুলায়হা তাদের সাহায্যকল্পে হিবালকে প্রেরণ করে। হিবাল ছিল তুলায়হার ভ্রাতুষ্পুত্র। যাহোক, এভাবে হিবাল যুল কাস্‌সায় অবস্থানকারীদের নেতা হয়ে যায় যেখানে আসাদ, লায়স, বীল ও মুদলেজ গোত্র হতে তাদের সমমনারা উপস্থিত ছিল। অওফ বিন ফুলান বিন সিনান আবরাকে অবস্থিত মুর্‌রা গোত্রের নেতা নিযুক্ত হয় আর সা'লাবা ও আবাস গোত্রের নেতা নিযুক্ত হয় হারেস বিন ফুলান, যে ছিল বনু সুবায়ের সদস্য। এসব গোত্র নিজ নিজ প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে যারা মদিনায় একত্র হয়, অর্থাৎ এরা একত্র হয়ে প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ প্রতিনিধিদল প্রস্তুত করে প্রেরণ করে। তারা এসে মদিনার গণ্যমান্যদের কাছে ওঠে। হযরত আব্বাস (রা.) ছাড়া বাকি সবাই তাদেরকে নিজ বাড়িতে আতিথেয়তা করে এবং তাদেরকে তারা হযরত আবু বকর (রা.)-এর সকাশে এই প্রস্তাবসহ নিয়ে আসেন যে, এরা নামায পড়বে কিন্তু যাকাত দিবে না। আল্লাহ্ তা'লা হযরত আবু বকর (রা.)-কে সত্য ও ন্যায়ের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, এরা যদি এই উট বাঁধার রশিও না দেয় তাহলেও তাদের বিরুদ্ধে আমি জিহাদ করব। হযরত আবু বকর (রা.)-এর দৃঢ় অবস্থান দেখে যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের দলগুলো যখন মদিনা থেকে ফিরে যাচ্ছিল তখন তাদের অবস্থা কীরূপ ছিল তার উল্লেখ করতে গিয়ে এক জীবনীকার লিখেন,

হযরত আবু বকর (রা.)-এর দৃঢ় সংকল্প দেখার পর এই প্রতিনিধি দলগুলো মদিনা থেকে ফিরে যায়। কিন্তু যাবার সময় দুটি কথা তাদের মাথায় ছিল। প্রথমত যাকাত না দেয়ার ব্যাপারে কোন আলোচনা সফল হবার নয়। এ বিষয়ে ইসলামের শিক্ষা সুস্পষ্ট আর খলীফার

নিজ মতামত ও দৃঢ় অবস্থান থেকে পিছু হটার কোন আশা নেই। বিশেষ করে দলিলপ্রমাণ সুস্পষ্ট হওয়ার পর মুসলমানরা যখন তার সাথে সহমত আর তারাও হযরত আবু বকর (রা.)-এর সাহায্য ও সমর্থনে বদ্ধপরিকর। দ্বিতীয়ত তাদের (অলীক) ধারণা অনুসারে মুসলমানদের দুর্বলতা এবং সংখ্যাস্বল্পতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মদিনায় প্রবল আক্রমণ করা উচিত যাতে ক্ষমতার অবসান ঘটে। অর্থাৎ তাদের (অলীক) ধারণা ছিল আমরা যদি এমনটি করি তাহলে এভাবে আমরা (মদিনা) করায়ত্ব করে নিব। যাহোক, এই (প্রতিনিধি দলের) লোকেরা ফেরত গিয়ে নিজ নিজ গোত্রসমূহকে বলে এখন মদিনার লোকসংখ্যা অত্যন্ত কম, অর্থাৎ তাদেরকে (মদিনা) আক্রমণ করার জন্য উস্কানী দেয়। অপরদিকে হযরত আবু বকর (রা.)ও এ বিষয়ে উদাসীন ছিলেন না। তিনি সেই প্রতিনিধি দল চলে যাবার পর মদিনার সকল চৌকিতে রীতিমতো প্রহরী মোতায়েন করেন। হযরত আলী (রা.), হযরত যুবায়ের (রা.), হযরত তালহা (রা.) এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.)-কে এই কাজে নিযুক্ত করা হয়। এক বর্ণনায় হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) ও হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ (রা.)-এর নামও উল্লেখ রয়েছে যে, তাদেরকেও চৌকিতে পাহারায় নিযুক্ত করা হয়। এছাড়াও হযরত আবু বকর (রা.) সকল মদিনাবাসীকে মসজিদে একত্রিত হওয়ার নির্দেশ দেন। এরপর তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, এ ভূখণ্ডের সবাই কাফির হয়ে গেছে আর তাদের প্রতিনিধিদল তোমাদের সংখ্যাস্বল্পতা দেখে গেছে এবং তোমরা জান না তারা দিনে তোমাদের ওপর আক্রমণ করবে নাকি রাতে। তাদের সবচেয়ে নিটবর্তী দলটি এক বারীদ দূরে অবস্থান করছে, অর্থাৎ বারো মাইল, এক বারিদ সমান বারো মাইল হয়ে থাকে। কিছু লোক চাইত, আমরা তাদের শর্তসমূহ মেনে নিয়ে তাদের সাথে সমঝোতা করে নিই, কিন্তু আমরা তাদের কথা মানি নি, বরং তাদের প্রস্তাবনা নাকচ করে দিয়েছি। যাহোক, এখন শত্রুর মোকাবিলার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ কর। হযরত আবু বকর (রা.)-এর ধারণা পুরোপরি সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। আর যাকাত প্রদানে অস্বীকারীদের প্রতিনিধিদল মদিনা থেকে ফেরত যাওয়ার পর কেবল তিন রাতই অতিবাহিত হয়েছিল আর (এরপর) রাত নামতেই তারা মদিনার ওপর আক্রমণ করে বসে। তাদের একটি দলকে তারা যু-হিস্সায় রেখে আসে যেন তারা প্রয়োজনের সময় শক্তি যোগানোর কাজে আসতে পারে। যু-হিস্সা বনু ফাযারার একটি ঝরনা আর এটি রাবাযা ও নাখলার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। যাহোক এই আক্রমণকারীরা রাতের আধারে মদিনার নিরাপত্তা চৌকিগুলোর কাছে পৌঁছে যায় যেখানে আগে থেকেই সৈন্য মোতায়েন করা ছিল, তাদের পেছনে আরো এমন কিছু লোক ছিল যারা উঁচুতে আরোহণ করছিল। নিরাপত্তারক্ষীরা তাদেরকে শত্রুদের হামলা সম্পর্কে সর্তক করে এবং হযরত আবু বকর (রা.)-কে শত্রুর আগ্রাসন সম্পর্কে অবগত করার জন্য দূত প্রেরণ করে। হযরত আবু বকর (রা.) সবাইকে নিজ নিজ জায়গায় দৃঢ় অবস্থান গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন, ফলে সকল সেনাদল তেমনই করে। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) মসজিদে উপস্থিত মুসলমানেদেরকে নিয়ে উটে আরোহণ করে তাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, ফলে শত্রুরা পিছু হটে যায়। মুসলমানেরা নিজেদের উটে আরোহণ করে তাদের পিছু ধাওয়া করে যু-হিস্সা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আক্রমণকারীদের সাহায্যকারী দল চামড়ার থলেতে বাতাস ভরে সেগুলোতে রশি দিয়ে বেঁধে মুসলমাদের মোকাবিলার জন্য অগ্রসর হয়। তারা তাদের পা দিয়ে আঘাত করে এই পানি বহনের থলেগুলোকে উটের সামনে ঝুলিয়ে দেয়। উট যেহেতু ঝুলন্ত দদুল্যমান কোন জিনিসকে সবচেয়ে বেশি ভয় পায় তাই (চামড়ার) পানির থলেগুলোকে দুলতে দুলতে আসতে দেখে মুসলমানদের উটগুলো এমনভাবে ভয় পেয়ে দৌঁড়াতে থাকে যে, উটের ওপর আরোহিত মুসলমানরা কোনভাবেই (উটগুলোকে) নিয়ন্ত্রণ করতে পারে নি আর এভাবে অবশেষে তারা মদিনায় পৌঁছে যায়। অবশ্য এতে মুসলমানদের কোনো ক্ষতি হয় নি আবার কোনকিছু তাদের

হস্তগতও হয় নি। মুসলমানদের বাহ্যত এই সাময়িক পিছপা হওয়ার ফলে শত্রুরা এই ধারণা করে যে, মুসলমানরা দুর্বল, তাদের মাঝে মোকাবিলা করার কোনো শক্তি নেই। তাদের এই অলীক ধারণার মাঝে তারা যুল কাস্‌সায় অবস্থানরত সঙ্গীদের এই ঘটনা অবগত করে, তারা এই সংবাদের ভিত্তিতে এই দলের কাছে পৌঁছায়। কিন্তু তারা জানতো না যে, আল্লাহ্ তা'লা তাদের বিষয়ে ভিন্ন কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন যা তিনি যেকোন মূল্যে বাস্তবায়ন করে ছাড়বেন। হযরত আবু বকর (রা.) রাতভর নিজের সেনাবাহিনীর প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন আর সবাইকে প্রস্তুত করে রাতের শেষভাগে পুরো সৈন্যবাহিনীকে বিন্যস্ত করে পায়ে হেঁটেই যাত্রা করেন। নোমান বিন মুকার্‌রিন (রা.) (সেনাদলের) ডান বাহুতে, আব্দুল্লাহ্ বিন মুকার্‌রিন (রা.) (সেনাদলের) বাম বাহুতে এবং সওয়ায়েদ বিন মুকার্‌রিন (রা.) সেনাদলের পেছনের অংশের দায়িত্বে ছিলেন, তাদের সাথে কতিপয় বাহনে আরোহী সেনাও ছিল। সূর্যোদয়ের পূর্বেই মুসলমানরা এবং যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীরা একই মাঠে মুখোমুখি ছিল। মুসলমানদের আগমনের আভাস ও সাড়াশব্দও তারা পায় নি, মুসলমানরা তাদের ওপর তরবারি নিয়ে অতর্কিতে হামলা করে বসে। রাতের শেষ প্রহরে যুদ্ধ হয়। সূর্যের কিরণ তখনও দিগন্তকে আপন আলোয় আলোকিত করে নি এমন সময় অস্বীকারকারীরা পরাজিত হয়ে পলায়নের পথ বেছে নেয়।

আরো লিখা আছে, মুসলমানরা তাদের সব পশু-পাখি করায়ত্ব করে নেয়। এ ঘটনায় হিবাল মারা যায়। হযরত আবু বকর (রা.) তাদের পশ্চাদ্ধাবণ করতে করতে যুল কাস্‌সায় গিয়ে উপস্থিত হন। এটি প্রথম বিজয় ছিল যা আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের প্রদান করেছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) নোমান বিন মুকার্‌রিনকে কিছু লোকসহ সেখানেই মোতায়েন করেন আর তিনি নিজে মদিনায় ফিরে আসেন। এটি 'তাবারী'র ইতিহাস থেকে নেয়া। এই যুদ্ধকে বদরের যুদ্ধের সাথে সাদৃশ্য দিতে গিয়ে একজন লেখক লিখেন, উক্ত ঘটনায় হযরত আবু বকর (রা.) যে ঈমান, বিশ্বাস, সংকল্প ও অবিচলতা এবং সাবধানতা ও সতর্কতা প্রদর্শন করেছেন তাতে মুসলমানদের হৃদয়ে মহানবী (সা.) এর যুগের বিভিন্ন যুদ্ধের স্মৃতি জাগ্রত হয়। আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতকালের এই প্রথম যুদ্ধ বদরের যুদ্ধের সাথে অনেকাংশেই সাদৃশ্যপূর্ণ। বদরের যুদ্ধে স্বল্পসংখ্যক, অর্থাৎ শুধু ৩১৩ জন মুসলমান ছিল, যার বিপরীতে মক্কার মুশরিকদের সংখ্যা এক হাজারের অধিক ছিল। উক্ত সময়ে, অর্থাৎ হযরত আবু বকরের সাথে বিরুদ্ধবাদীদের যুদ্ধের যে ঘটনা ঘটেছে তখনও মুসলমানদের সংখ্যা খুবই অল্প ছিল। এর বিপরীতে আব্‌স, যুবইয়ান এবং গাতফান গোত্রসমূহ বিশাল জনবল নিয়ে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করেছিল। বদরের যুদ্ধে আল্লাহ্ তা'লা মুশরিকদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় দান করেন আর এখানেও আবু বকর (রা.) এবং তাঁর সঙ্গীসাথীরা দৃঢ় ঈমানের স্বাক্ষর রেখেছেন আর শত্রুদের ওপর বিজয় লাভ করেছেন। যেভাবে বদরের যুদ্ধ সুদূরপ্রসারী ফলাফল বয়ে এনেছিল তদ্রূপ এ যুদ্ধেও মুসলমানদের বিজয় ইসলামের ভবিষ্যতের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছে। বনু যুবইয়ান এবং বনু আবস গোত্র এ পরাজয়ের কারণে ক্রোধ ও ক্ষোভে নিজ এলাকার মুসলমানদের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ করে তাদেরকে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে বিভিন্ন ধরনের কষ্ট দিয়ে শহীদ করে দেয়। তারা এই প্রতিশোধ নেয়, অর্থাৎ তাদের এলাকায় যেসব নিরস্ত্র মুসলমান বাস করত তাদেরকে হত্যা করে শহীদ করে দেয় আর তাদের অনুকরণে অন্যান্য গোত্রও একই কাজ করে। এসব অত্যাচারের সংবাদ পেয়ে হযরত আবু বকর (রা.) কসম খেয়ে প্রতিজ্ঞা করেন, তিনি মুশরিকদের যথোচিতভাবে হত্যা করবেন আর যেসব গোত্রে যারাই মুসলমানদের হত্যা করেছে তাদেরকে প্রতিশোধস্বরূপ হত্যা করবেন। হযরত আবু বকর (রা.)-এর নেতৃত্ব এবং দিক-নির্দেশনায় যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের ওপর আক্রমণের পর বিভিন্ন দুর্বল এবং দ্বিধান্বিত গোত্রসমূহ একের পর এক নিজেদের যাকাত নিয়ে

মদিনায় আসতে থাকে। দুর্বল গোত্রসমূহ যারা যাকাতের সম্পদ ধরে রেখেছিল তারা যখন শক্তিশালী গোত্রগুলোর এই অবস্থা দেখে তখন তারা যাকাত নিয়ে মদিনায় আসতে আরম্ভ করে। কোন গোত্র রাতের প্রথমাংশে যাকাত নিয়ে আসে, কেউ রাতের মধ্যাংশে আবার কেউবা রাতের শেষাংশে আসে। যখন এরা মদিনায় আসত তখন প্রত্যেক দলের আগমনের সময় লোকজন বলত, এরা ভয়ের কারণ বলে মনে হচ্ছে, অর্থাৎ কোন দুঃসংবাদ আনয়নকারী। কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) সকল ক্ষেত্রে এটিই বলেন যে, এরা সুসংবাদ বহনকারী, সমর্থনের জন্য এসেছে ক্ষতিসাধনের জন্য নয়। যাহোক, এটি যখন স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এই দলগুলো ইসলামের সাহায্যার্থে এসেছে আর যাকাতের সম্পদ সাথে নিয়ে এসেছে তখন মুসলমানরা হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলল, আপনি খুবই কল্যাণমণ্ডিত একজন মানুষ, আপনি সর্বদা সুসংবাদই দিয়ে আসছেন। এতে হযরত আবু বকর (রা.) এটিও বলেন যে, দুঃসংবাদ এবং মন্দ উদ্দেশ্যে আগমনকারীরা তড়িঘড়ি যাত্রা করে পক্ষান্তরে সুসংবাদ আনয়নকারী দল শান্ত ও ধীরে-সুস্থে যাত্রা করে। আমি তাদের গতিবিধির মাধ্যমে ধারণা করে নেই। যাকাত প্রদানে অস্বিকারকারীদের বিরূদ্ধে সফলতা লাভের পর যাকাত আদায় সম্পর্কে তাবারির ইতিহাসে উল্লেখ আছে, সেই যুগে মদিনায় এত বেশি যাকাত সমবেত হয় যা মুসলমানদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ছিল। এসব বিজয় এবং সুসংবাদের মাঝেই হযরত উসামার বাহিনীও সাফল্য ও বিজয়মাল্য পরিহিত হয়ে মদিনায় ফিরে আসে। হযরত উসামার ফিরে আসার পর হযরত আবু বকর (রা.) তাকে মদিনায় নিজের নায়েব নিযুক্ত করেন। এটিও বলা হয়ে থাকে যে, হযরত আবু বকর সিনান যামরীকে নিজের নায়েব নিযুক্ত করেছিলেন আর তাকে (অর্থাৎ উসামাকে) এবং তার বাহিনীকে বলেন, এখন তোমরাও বিশ্রাম নাও আর বাহনরূপে ব্যবহৃত পশুগুলোকেও বিশ্রাম নিতে দাও। আর হযরত আবু বকর (রা.) স্বয়ং লোকজনের সাথে বাহনে বসে যুল কাস্‌সা রওয়ানা হন। কিন্তু মুসলমানরা হযরত আবু বকর (রা.)-এর সমীপে নিবেদন করে যে, হে রসূল (সা.)-এর খলীফা! আপনার কাছে খোদার দোহাই দিয়ে অনুরোধ করছি, আপনি স্বয়ং এই অভিযানে যাবেন না। কেননা আল্লাহ্ না করুন, যদি আপনার কোন ক্ষতি হয়ে যায় তাহলে পুরো ব্যবস্থাপনা ভেঙ্গে পড়বে। আপনি এই কাজের জন্য অন্য কাউকে প্রেরণ করুন, যেন তার কোন কিছু হলে আপনি অন্য কাউকে তার স্থলে নিযুক্ত করতে পারেন। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমি কিছুতেই এমনটি করব না। আমি নিজের প্রাণ দিয়ে আপনাদের দুঃখ লাঘব করব।

অতঃপর রাবাযাবাসীদের ওপর আক্রমণ সম্পর্কে লিখিত আছে, হযরত আবু বকর (রা.) সবকিছুর ব্যবস্থা করে যু-হিস্‌সা এবং যুল কাস্‌সা চলে যান। যুল কাস্‌সা মদিনা থেকে ৪০ মাইল দূরবর্তী একটি স্থান। নোমান, আব্দুল্লাহ্ আর সুআয়েদ নিজ নিজ স্থানে ছিলেন। এক পর্যায়ে হযরত আবু বকর আবরাক নামক স্থানে রাবাযাবাসীদের বসতিস্থলে পৌঁছে যান আর প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। অবশেষে আল্লাহ্ তা'লা হারেস এবং অউফকে পরাজিত করেন, যারা মুররা, সালেবা এবং আবাস গোত্রের নেতা ছিল। ফুতায়হাকে জীবিত আটক করা হয়। হযরত আবু বকর কয়েক দিন আবরাক-এ অবস্থান করেন এবং আবরাক অঞ্চলকে মুসলমানদের ঘোড়া সমূহের চারণভূমি বানিয়ে দেন। এই যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বনু আবস এবং বনু যুবইয়ান (গোত্র) তুলায়হার দলে যোগ দেয়, যে সুমায়রা থেকে রওয়ানা হয়ে বুযাখায় অবস্থান গ্রহণ করে। বুযাখা হলো বনু আসাদ গোত্রের ঝরনার নাম, যেখানে তুলায়হা আসাদী-র সাথে হযরত আবু বকরের যুগে ভয়াবহ যুদ্ধ হয়েছিল।

অতঃপর একজন লেখক পরাজিত গোত্রগুলোর আচরণ সম্পর্কে লিখেন, আবাস, যুবইয়ান, গাতফান, বনু বকর এবং মদিনার নিকটে বসবাসকারী অন্যান্য বিদ্রোহী গোত্রগুলোর জন্য সমীচীন ছিল হঠকারিতা এবং বিদ্রোহ থেকে বিরত হয়ে হযরত আবু বকর (রা.)-এর

পূর্ণ আনুগত্য ও ইসলামী নির্দেশাবলী পালনের অঙ্গীকার করা আর মুসলমানদের সাথে একত্রিত হয়ে মুরতাদ তথা ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া। বুদ্ধিমত্তার দাবিও এটিই ছিল আর বাস্তব পরিস্থিতিও এটিকেই সমর্থন করতো। হযরত আবু বকরের মাধ্যমে তাদের শক্তি খর্ব হয়ে পড়েছিল। রোমান সীমান্তে সফলতা লাভের কারণে মদিনাবাসীদের প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। মুসলমানদের শক্তি ও সামর্থ্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। আর এখন তারা সেই দুর্বল অবস্থায় ছিল না যা বদরের যুদ্ধ এবং প্রাথমিক রণসমূহে তাদের ছিল। তখন মক্কা-ও তাদের সাথে ছিল আর তায়েফও। এই উভয় শহরের নেতৃত্ব পুরো আরবে স্বীকৃত ছিল। এছাড়া স্বয়ং সেই গোত্রগুলোতে বহু এমন মুসলমান ছিল যাদেরকে বিদ্রোহীরা কোনভাবেই নিজেদের দলভুক্ত করতে পারে নি। এভাবে তাদের অবস্থান খুবই দুর্বল হয়ে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও মুসলমানদের প্রতি শত্রুতা তাদের চোখ অন্ধ করে দিয়েছিল আর লাভলোকসানের চেতনা তাদের মাঝ থেকে হারিয়ে যেতে থাকে। তারা নিজেদের মাতৃভূমি পরিত্যাগ করে আর বনু আসাদ গোত্রের নবুয়্যতের মিথ্যা দাবিকারক তুলায়হা বিন খুয়ায়লেদ-এর সাথে যোগ দেয়। তাদের মাঝে যেসব মুসলমান ছিল তারা তাদেরকে তাদের অভিসন্ধি থেকে বিরত রাখতে পারে নি। তাদের সেখানে পৌঁছানোর ফলে তুলায়হা এবং মুসায়লামার শক্তি বৃদ্ধি ঘটে আর ইয়েমেনে বিদ্রোহের অনল দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে।

যাহোক এটি সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, তারা বিদ্রোহ করেছিল এবং যুদ্ধ করেছিল। শুধু কোন দাবি বা কারো দাবির কারণে এই যুদ্ধ হয় নি। বিদ্রোহের প্রতিশোধ গ্রহণ করা হচ্ছিল। আর যে যুদ্ধ আরম্ভ করা হয়েছিল তার উত্তর দেয়া হচ্ছিল যুদ্ধের মাধ্যমে। যাকাতের অস্বীকারকারীদের ওপর বিজয় লাভ এবং হযরত আবু বকর (রা.)-এর বীরত্ব ও দৃঢ়সংকল্পের উল্লেখ করতে গিয়ে আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ তার একটি রেওয়ায়েতে বলেন,

মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর আমরা এমন এক অবস্থানে ছিলাম যে, আল্লাহ্ তা'লা যদি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর মাধ্যমে আমাদের সাহায্য না করতেন তাহলে ধ্বংস অনিবার্য ছিল। আমাদের সমস্ত মুসলমানের সর্বসম্মত ধারণা এটিই ছিল যে, আমরা যাকাতের উটের জন্য অন্যদের সাথে যুদ্ধ করব না। আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতে মগ্ন হয়ে যাব যতক্ষণ না আমাদের পূর্ণ বিজয় লাভ হয়। কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) যাকাতের অস্বীকারকারীদের সাথে লড়াইয়ের জন্য দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হন। তিনি অস্বীকারকারীদের সামনে কেবল দু'টি বিষয় উপস্থাপন করেন, তৃতীয় কোন বিষয় নয়। প্রথমত নিজেদের জন্য তাদেরকে অপমান ও লাঞ্ছনা বরণ করে নিতে হবে, আর যদি তা মেনে না নেয় তাহলে যেন তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। নিজেদের জন্য অপমান ও লাঞ্ছনা বরণ করার অর্থ ছিল তাদের এ কথা স্বীকার করা যে, তাদের নিহতরা জাহান্নামী এবং আমাদের নিহতরা জান্নাতী। তারা আমাদেরকে আমাদের নিহতদের রক্তপণ দিবে। আমরা তাদের কাছ থেকে গনিমতের সম্পদ হিসেবে যা নিয়েছি তা ফিরিয়ে দেয়ার দাবি উত্থাপন করবে না। কিন্তু যে সম্পদ তারা আমাদের কাছ থেকে নিয়েছে তা আমাদেরকে ফেরত দিতে হবে। আর দেশান্তরের শাস্তি গ্রহণ করার অর্থ হলো, পরাজিত হওয়ার পর নিজেদের এলাকা ছেড়ে চলে যেতে হবে এবং দূর দূরান্তের অঞ্চলে গিয়ে জীবন অতিবাহিত করবে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ সম্পর্কে বলেন,

মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর কতিপয় আরব গোত্র যখন যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায় তখন হযরত আবু বকর (রা.) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যান। তখন পরিস্থিতি এত স্পর্শকাতর ছিল যে, হযরত উমরের ন্যায় ব্যক্তি তাদের প্রতি নম্রতা প্রদর্শনের পরামর্শ দেন। এর উল্লেখ পূর্বেও করা হয়েছে যে, হযরত আবু বকর (রা.) উত্তর দেন, আবু কোহাফার পুত্রের কী সাধ্য যে, সে সেই আদেশকে রহিত করবে যা মহানবী (সা.) প্রদান

করেছেন। খোদার কসম, তারা যদি মহানবী (সা.)-এর যুগে উটের হাঁটু বাঁধার একটি রশিও যাকাত হিসেবে দিয়ে থাকতো তাহলে সেই রশিও আমি তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করে ছাড়ব। আর ততক্ষণ ক্ষান্ত হব না যতক্ষণ তারা যাকাত প্রদান না করবে। তিনি তার সঙ্গীদের বলেন তোমরা যদি এই বিষয়ে আমার সঙ্গ দিতে না পার, তাহলে দিও না। আমি একাই তাদের মোকাবিলা করব। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এটি মহানবী (সা.)-এর কত উচ্চ মানের আনুগত্য যে, একান্ত বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতিতে বড় বড় সাহাবীদের লড়াইয়ের বিরুদ্ধে পরামর্শ দেয়া সত্ত্বেও মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ পূর্ণ করার জন্য তিনি সকল প্রকার ঝুঁকি মাথাপেতে নেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান!

অতঃপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) অপর এক স্থলে বর্ণনা করেন,

হযরত আবু বকর (রা.)-এর যুগে যখন ধর্মত্যাগের ফিতনা ছড়িয়ে পড়ে আর কেবল গ্রামগুলোতে বাজামা'ত নামায পড়ার রীতি বাকি রয়ে যায়, অধিকন্তু সেনাবাহিনীও সিরিয়ায় পাঠিয়ে দেয়া হয়, তাসত্ত্বেও তিনি যাকাত প্রদানকারীদের নামে নির্দেশ প্রেরণ করেন, মহানবী (সা.)-এর যুগে কেউ যদি রশিও দিতো আর এখন না দেয়, তাহলে আমি তরবারির জোরে তা আদায় করব। হযরত উমরের ন্যায় বীর ও সাহসী ব্যক্তিও এই মত প্রদান করেন যে, এখন সময়ের দাবি এটি নয় যে, যাকাতের ওপর জোর দেয়া হবে, কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) তার কোন কথা শুনেন নি। এ থেকে বোঝা যায় যে, যাকাত কতটা আবশ্যক। এই কথাটি, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাঁর এক বক্তৃতার বর্ণনা করেছিলেন যাতে তিনি তাকওয়ার বিভিন্ন স্তরের বিষয়টি তুলে ধরেছিলেন। তাতে তিনি তাকওয়ার ধাপগুলো কি কি আর যাকাতের কতটা গুরুত্ব রয়েছে এবং তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য তা একান্ত আবশ্যক– এসব বিষয়ের উল্লেখ করেন। সেখানে তিনি একথাও বলেছিলেন যে, আহমদীদেরও এই বিষয়টি স্মরণ রাখা উচিত যে, যাকাত কতটা আবশ্যক এবং তা নিয়মিত আদায়ের ব্যবস্থা করা উচিত।

অপর এক স্থানে হযরত মুসলেহ্ মওউদ বলেন,

একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যাকাত; [যাকাতের বিষয়ে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি একথা বলেন;] কিন্তু মানুষজন এটি বোঝে নি। খোদা তা'লা নামাযের পরই এর নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত আবু বকর বলেন, যারা যাকাত দেবে না, তাদের সাথে আমি সেই আচরণই করব যা মহানবী (সা.) কাফেরদের সাথে করতেন। এমন লোকদের পুরুষ সদস্যদেরকে আমি দাস বানাব ও তাদের নারীদেরকে বানাব দাসী। মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর এমন বিপদ উপস্থিত হয় যে, আরবের তিনটি শহর- মক্কা, মদিনা ও আরেকটি শহর ছাড়া সব অঞ্চল মুরতাদ (তথা ধর্মত্যাগী) হয়ে যায়। হযরত উমর (রা.) নিবেদন করেন যে, ঠিক আছে, যাকাতের অস্বীকারকারীদের সাথে সন্ধি করে নিন! প্রথমে অন্য মুরতাদদের সাথে যুদ্ধ হয়ে যাক, ধীরে ধীরে এদেরও সংশোধন হয়ে যাবে। প্রথম প্রয়োজন নবুয়তের মিথ্যা দাবিকারকদের সমূলে বিনাশ করা উচিত, কারণ তাদের সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা অধিক তীব্র। হযরত আবু বকর বলেন, লোকজন যদি ছাগলছানা বা উটের হাঁটু বাঁধার রশির সমান পরিমাণ যাকাতের প্রাপ্য জিনিসও প্রদান না করে যা মহানবী (সা.)-এর কাছে প্রদান করতো, তবে আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করব। আর যদি তোমরা আমাকে ছেড়ে চলে যাও এবং বনের হিংস্র পশুরাও মুরতাদদের সাথে একযোগে আক্রমণ করে, তবে আমি একাই তাদের সাথে লড়ব। খিলাফতের কল্যাণরাজির মধ্যে এটিও অন্যতম যে, শরীয়ত প্রতিষ্ঠার জন্য যুগ-খলীফা পূর্ণ প্রচেষ্টা করে থাকেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) অন্যত্র বর্ণনা করেন, মানুষজন আরেকটি আপত্তি করে থাকে, কিন্তু খোদা তা'লা সেটির উত্তরও তেরশ' বছর পূর্বেই দিয়ে দিয়েছেন। মানুষ [অর্থাৎ

আপত্তিকারীরা] বলে, شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ (সূরা আলে ইমরান: ১৬০) [অর্থাৎ, তাদের সাথে পরামর্শ কর;] নির্দেশটি তো মহানবী (সা.)-কে দেয়া হয়েছে; এর মাঝে খিলাফত এল কোত্থেকে? খিলাফতের জন্য তো এই নির্দেশ প্রযোজ্য নয়! কিন্তু তারা যেন স্মরণ রাখে যে, যাকাত প্রসঙ্গে যখন হযরত আবু বকরের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপিত হয় সেটিও এ ধরনেরই ছিল যে خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً (সূরা তওবা: ১০৩) [অর্থাৎ, তাদের সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ কর]– এই নির্দেশ তো মহানবী (সা.)-কে দেয়া হয়েছে; এখন তিনি নেই, তাই অন্য কারো অধিকার নেই যে, সে যাকাত আদায় করবে। যাকে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন। হযরত আবু বকর এই উত্তরই প্রদান করেন যে, এখন আমি হলাম সম্বোধিত ব্যক্তি। অর্থাৎ হযরত আবু বকর এখন সম্বোধিত ব্যক্তি। মহানবী (সা.) মৃত্যু বরণ করেছেন, কিন্তু শরীয়ত তো সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে; তাই এখন সম্বোধিত ব্যক্তি হলেন যুগ-খলীফা। হযরত মুসলেহ্ মওউদ যখন এই বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তখন তিনি বলেন, এই সুরে সুর মিলিয়ে আমি আমার ওপর আপত্তিকারীদের বলছি যে, এখন আমি হলাম সম্বোধিত ব্যক্তি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, যদি সেই সময়ে এই উত্তর সঠিক হয়ে থাকে, এবং অবশ্যই সেটি সঠিক ছিল যা হযরত আবু বকর উত্তরে বলেছিলেন, তাহলে আমি যা বলছি তা-ও সঠিক যে, আজ আমি হলাম সম্বোধিত ব্যক্তি। আর এই নীতিই সর্বদা খিলাফতের ক্ষেত্রে প্রজোয্য হবে। এই কথাটি স্মরণ রাখার মতো! এরপর তিনি বলেন, তোমাদের আপত্তি যদি সঠিক হয়, তবে তো কুরআন শরীফ থেকে অনেক নির্দেশ বাদ দিয়ে দিতে হবে, আর তা হবে সুস্পষ্ট ভ্রান্তি। এই কথাগুলো তিনি (রা.) ঐ সময়ে বলছিলেন, যখন তিনি মনসবে খিলাফত (বা খিলাফতের মর্যাদার) বিষয়ে একটি বক্তৃতা করছিলেন।

এরপর অপর এক স্থানে হযরত মুসলেহ্ মওউদ বর্ণনা করেন,

মহানবী (সা.) মৃত্যু বরণ করলে অনেক অভাগা মুসলমান মুর্তাদ হয়ে যায়। ইতিহাসে লেখা আছে, কেবল এমন তিনটি স্থান অবশিষ্ট ছিল যেখানে মসজিদে বাজামা'ত নামায পড়া হতো। একইভাবে রাষ্ট্রের অধিকাংশ লোক যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায় আর তারা বলা শুরু করে যে, মহানবী (সা.)-এর (মৃত্যুর) পর আমাদের কাছে যাকাত চাওয়ার কী অধিকার আছে? যখন এই ধ্যানধারণা পুরো আরবে ছড়িয়ে পড়ে আর হযরত আবু বকর (রা.) এমন লোকদের বিরূদ্ধে কঠোর অবস্থান নেয়ার মনস্থ করেন তখন হযরত উমর (রা.) এবং অন্যান্য সাহাবীরাও হযরত আবু বকর (রা.)-এর সমীপে এসে উপস্থিত হন আর পূর্বেও যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা এসে নিবেদন করেন, এখন পরিস্থিতি বেশ স্পর্শকাতর, এ মুহূর্তে সামান্য অবহেলা বিরাট ক্ষতির কারণ হতে পারে তাই আমাদের পরামর্শ হলো, এত বড় শত্রুর মোকাবিলা করার পরিবর্তে যারা যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে তাদের সাথে বিনম্র আচরণ করা হোক। হযরত আবু বকর (রা.) উত্তরে বলেন, তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তি ভয় পায়, সে যেখানে খুশি চলে যেতে পারে। আল্লাহ্‌র শপথ! তোমাদের একজনও যদি আমাকে সঙ্গ না দেয় তবুও আমি একাই শত্রুর মোকাবিলা করব আর শত্রু যদি মদিনায় প্রবেশ করে এবং আমার প্রিয়জন আর নিকটাত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুদেরকে হত্যা করে আর কুকুর যদি মহিলাদের লাশ নিয়ে মদিনার অলি-গলিতে টানাহ্যাঁচড়াও করে তবুও আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করব এবং ততক্ষণ পর্যন্ত আমি ক্ষান্ত হব না যতক্ষণ এরা উটের পা বাঁধার সেই রশিও যাকাত হিসেবে প্রদান না করে যা তারা পূর্বে প্রদান করত। মোটকথা হযরত আবু বকর (রা.) শত্রুর দুষ্কর্মের বীরবিক্রমে মোকাবিলা করেছেন এবং অবশেষে সফলও হয়েছেন, তা কেবল এ কারণে যে, তিনি (রা.) জানতেন, এ কাজ আমাকেই করতে হবে। তাই তিনি পরামর্শদানকারী সাহাবীদের বলেছিলেন, তোমাদের মাঝ থেকে কেউ আমাকে সঙ্গ দিক বা না দিক, যতক্ষণ আমি জীবিত আছি আমি একা-ই শত্রুর মোকাবিলা করব। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)

বলেন, অতএব যে জাতির মাঝে এমন দৃঢ়প্রত্যয় সৃষ্টি হয়ে যায়, তারা প্রত্যেক ময়দানে বিজয়ী হয় আর শত্রু তাদের সামনে দাঁড়াতে পারে না এবং জাতীর উন্নতির এটিই রহস্য– যা সদা স্মরণ রাখা আবশ্যক।

অন্য এক স্থলে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর যাকাতের বিষয়ে মতভেদের কারণে যখন আরবের হাজার হাজার লোক মুর্তাদ হয়ে যায় এবং মুসায়লামা মদিনার ওপর আক্রমণ করতে উদ্যত হয় তখন তৎকালীন খলীফা হযরত আবু বকর (রা.) এ বিষয়ে সংবাদ পান যে, মুসায়লামা এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করতে আসছে। এমতাবস্থায় কিছু লোক হযরত আবু বকর (রা.)-কে এই পরামর্শ দেয় যে, এ মুহূর্তে আমরা যেহেতু এক স্পর্শকাতর সময় অতিক্রম করছি আর যাকাত সম্পর্কে মতবিরোধের কারণে লোকজন মুর্তাদ হয়ে যাচ্ছে, আবার অপরদিকে মুসায়লামা বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে আক্রমণ করতে উদ্যত, তাই এমন অবস্থার নিরিখে যা সমীচীন বলে অনুমেয় তা হলো, আপনি আপাতত যাকাতের দাবি ছেড়ে দিন এবং তাদের সাথে সন্ধিচুক্তি করে নিন। হযরত আবু বকর (রা.) সেসব শঙ্কার প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ করেন নি। ভ্রুক্ষেপহীনতার প্রকাশ করতে গিয়ে পরামর্শদাতাদের তিনি বলেন, তোমরা কি আমাকে সে কথা মানাতে চাও- যা খোদা তা'লা এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর আদেশের সম্পূর্ণ বিপরীত? যাকাতের আদেশ খোদা তা'লা এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। তাই খোদা এবং তাঁর রসূল (সা.)–এর আদেশের বাস্তবায়নের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা আমার জন্য আবশ্যক। সাহাবীরা পুনরায় বলেন, পরিস্থির নিরিখে সন্ধি করা এখন সময়ের দাবি। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আপনারা যদি যুদ্ধ করতে আগ্রহী না হন এবং শত্রুর মোকাবিলায় যুদ্ধ করার শক্তি-সামর্থ্য না রাখেন তাহলে আপনারা গিয়ে নিজ নিজ গৃহে বসে থাকুন। আল্লাহ্‌র শপথ, আমি শত্রুর সাথে একাই ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করে যাব যতক্ষণ যাকাত হিসেবে প্রদেয় উটের পা বাঁধার রশি প্রদান না করবে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তাদের যাকাত প্রদানের স্বীকারোক্তি আদায় না করছি ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে কখনো মিমাংসা করব না। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, প্রকৃত ঈমানের বৈশিষ্ট্য এটিই। অতএব এটিই ঈমান আর এটি যদি আমাদের মাঝে থাকে তবে আমরা পৃথিবীব্যাপী ইসলামের প্রকৃত বার্তা পৌঁছে দিতে সক্ষম হব এবং ইনশাল্লাহ্ সফল হব।

অতঃপর এক স্থলে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,

মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর আরবের গোত্রগুলো বিদ্রোহ করে বসে এবং তারা যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায়। তারাও এই যুক্তি প্রদর্শন করতো যে, আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.) ছাড়া অন্য কাউকে যাকাত আদায়ের অধিকার দেন নি। আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে সম্বোধন করে বলেন, হে মুহাম্মদ (সা.)! তুমি তাদের সম্পদ থেকে যাকাত হিসেবে কিছু অংশ গ্রহণ কর। এমন কথা কোথাও উল্লেখ নেই যে, মহানবী (সা.)-এর পর অন্য কারো যাকাত গ্রহণের অধিকার রয়েছে, কিন্তু মুসলমানরা তাদের এই যুক্তি গ্রহণ করে নি যখন কিনা সেখানে বিশেষভাবে মহানবী (সা.)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। মোটকথা, তখন যারা মুর্তাদ হয়েছে তাদের শক্তিশালী যুক্তি এটিই ছিল যে, যাকাত গ্রহণের অধিকার কেবল মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ছিল; অন্য কারো নয়। আর এর নেপথ্যে এই ভুল ধারণাটিই ছিল যে, নেযাম (বা ব্যবস্থাপনা) সংক্রান্ত বিধিবিধান সবসময় অনুসরণযোগ্য নয়, বরং তা একান্তই মহানবী (সা.)-এর জন্য নির্ধারিত ছিল। কিন্তু তিনি (রা.) বলেন, এটি সম্পূর্ণ একটি ভ্রান্ত ধারণা। প্রকৃত বিষয় হলো, যেভাবে নামায-রোযার বিধি-বিধান মহানবী (সা.)-এর যুগাবসানের মাধ্যমে রহিত হয়ে যায় নি, অনুরূপভাবে জাতিগত বা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিধি-বিধানও তাঁর (সা.) মৃত্যুর সাথে সাথে রহিত হয়ে যায় নি। বাজামা'ত নামাযের ন্যায় যা

একটি সমষ্টিগত ইবাদত, এসব বিধি-বিধানের ক্ষেত্রেও আবশ্যক হলো– মহানবী (সা.)-এর নায়েবদের মাধ্যমে সদা তা বাস্তবায়িত হওয়া।

অতঃপর আরেক স্থানে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,

মহানবী (সা.) যখন মৃত্যু বরণ করেন এবং হযরত আবু বকর (রা.) খলীফা নিযুক্ত হন তখন গোটা আরব মুর্তাদ হয়ে যায়। মক্কা-মদিনা আর ছোট্ট একটি উপশহর ছাড়া সবাই যাকাত দিতে অস্বীকার করে বসে এবং বলে, আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে বলেছিলেন خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً অর্থাৎ তাদের ধনসম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ কর (সূরা তওবা: ১০৩)। অন্য কারো আমাদের নিকট থেকে যাকাত আদায়ের কোন অধিকার নেই। মোটকথা, গোটা আরব মুর্তাদ হয়ে যায় আর কেবল মুর্তাদ-ই হয় নি বরং যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। মহানবী (সা.)-এর যুগে ইসলাম (প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে) দুর্বল ছিল, কিন্তু আরবের গোত্রগুলো পৃথক পৃথকভাবে আক্রমণ করতো। কখনো একটি গোত্র আক্রমণ করলে কখনো অন্য গোত্র। আহযাবের যুদ্ধে কাফেরদের সৈনাবাহিনী যখন জোটবদ্ধভাবে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করে সে সময় পর্যন্ত ইসলাম অনেকটা শক্তি সঞ্চয় করে ফেলেছিল; যদিও তখনও ততটা ক্ষমতাশীল হয়ে ওঠে নি যাতে ভবিষ্যতে নিজেদের ওপর আর কোন ধরনের আক্রমণের শঙ্কা নেই বলে মুসলমানরা ধারণা করতে পারে। অতঃপর মহানবী (সা.) মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। তখন আরবের কয়েকটি গোত্রও তাঁর (সা.) সমর্থনে দণ্ডায়মান হয়। অনুরূপভাবে খোদা তা'লা শত্রুদের মধ্যে উদ্দীপনা ক্রমান্বয়ে সৃষ্টি করেন যেন তারা গোটা দেশে বিস্তৃতি লাভ করার মতো প্রবল ক্ষমতাধর না হয়ে ওঠে, কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.)-এর যুগে একযোগে গোটা আরব মুর্তাদ হয়ে যায়; কেবল মক্কা, মদিনা ও একটি ছোট উপশহর অবশিষ্ট ছিল আর বাদ বাকি সব স্থানে মানুষ যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং সৈনাবাহিনী নিয়ে মোকাবিলার উদ্দেশ্যে বের হয়। কেবল যাকাত দিতেই অস্বীকৃতি জানায় নি, বরং তারা সৈন্য নিয়ে লড়াই করতে বেরিয়ে পড়ে। কোন কোন স্থানে তাদের নিকট লক্ষ লক্ষ সৈন্য ছিল। আর অপরদিকে এখানে কেবলমাত্র দশ হাজারের একটি সেনাদল ছিল আর তা-ও আবার সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। আর এটি সেই সেনাদল যা মহানবী (সা.) নিজ মৃত্যুর নিকটবর্তী সময়ে রোমীয় এলাকায় অভিযানের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন আর উসামাকে এই বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন। অবশিষ্ট যারা ছিল তারা হয়ত বৃদ্ধ ও দুর্বলরা ছিল বা হাতে গোনা কয়েকজন যুবক ছিল। এই অবস্থা দেখে সাহাবীরা মনে করেন যে, এমন বিদ্রোহের সময় উসামার নেতৃত্বাধীন এই সেনাদলও যদি যাত্রা করে তাহলে মদিনার নিরাপত্তার কোন উপায় থাকবে না। অতএব (এমন পরিস্থিতি দেখে) জ্যেষ্ঠ সাহাবীদের একটি দল হযরত আবু বকর (রা.)-র সমীপে উপস্থিত হয়; যেমনটি পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে। তারা নিবেদন করে, এই সেনাদলকে কিছুদিনের জন্য যাত্রা করা থেকে বিরত রাখা হোক। যখন বিদ্রোহ দমে যাবে তখন নিঃসন্দেহে এই সেনাদল পাঠানো যাবে, কিন্তু এই মুহূর্তে এটিকে প্রেরণ করা বিপজ্জনক। হযরত আবু বকর (রা.) অত্যন্ত রাগান্বিত স্বরে বলেন, তোমরা কি চাও মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর আবু কুহাফার পুত্র সর্বপ্রথম যে কাজটি করবে তা হলো, মহানবী (সা.) যে সৈন্যবাহিনীকে প্রেরণ করার আদেশ দিয়েছিলেন– তা প্রেরণ নিষিদ্ধ করবেন? যাহোক তিনি (রা.) বলেন, এটি যাত্রা করবেই আর মহানবী (সা.) যে সেনাদলকে প্রেরণ করতে আদেশ দিয়েছিলেন, আমি সেটিকে অবশ্যই প্রেরণ করব। তোমরা যদি শত্রুসেনাকে ভয় পাও তাহলে নিঃসংকোচে আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করতে পার। আমি একাই সকল শত্রুর মোকাবিলা করব। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এটি يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا– এর সত্যতার অনেক বড় একটি প্রমাণ। অর্থাৎ, এই মু'মিনরা আমার ইবাদত করবে আর আমার সাথে কাউকে শরীক

দাঁড় করাবে না, অর্থাৎ খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিতরা বা খিলাফতের অনুসারীরা। আর এটি হলো সেই অবস্থা– যা খিলাফত ব্যবস্থার সাথে চলমান আছে এবং চলমান থাকবে।

এরপর তিনি (রা.) বলেন, দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল যাকাত বিষয়ক। সাহাবীগণ নিবেদন করেন, আপনি যদি এই সেনাবাহিনীর যাত্রা স্থগিত করতে না পারেন তাহলে অন্তত এটি করুন যে, এদের সাথে সাময়িক সন্ধি করে নিন আর তাদেরকে বলে দিন যে, আমরা এ বছর তোমাদের কাছ থেকে যাকাত নিব না। আর এই সময়ের মধ্যে তাদের উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে যাবে আর অনৈক্য দূর হওয়ার একটি অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যাবে। কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, এমনটি কখনো হবে না। [তিনি এ কথাও মানেন নি।] এ কথা শুনে সাহাবীগণ বলেন, উসামার সৈন্যবাহিনীও যদি চলে যায় আবার এ সকল লোকদের সাথে সাময়িক সন্ধিও না করা হয় তাহলে শত্রুদের প্রতিরোধ কে করবে? মদিনায় তো শুধু এই কয়েকজন বৃদ্ধ ও দুর্বল ব্যক্তি আর কিছু যুবক রয়েছে, তারা এই লক্ষ সৈন্যের মোকাবিলা কীভাবে করবে? হযরত আবু বকর (রা.) উত্তরে বলেন, হে বন্ধুরা! তোমরা যদি এদের মোকাবিলা করতে না পার তাহলে আবু বকর একাই তাদের মোকাবিলার জন্য দণ্ডায়মান হবে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এই ঘোষণা সেই ব্যক্তির যিনি রণকৌশল সম্বন্ধে খুব বেশি অবগত ছিলেন না আর যার সম্পর্কে সাধারণত এই ধারণাই করা হতো যে, তিনি দুর্বল হৃদয়ের অধিকারী। তাহলে এই সাহস, এই বীরত্ব, এই বিশ্বাস, এই দৃঢ়তা তাঁর মাঝে কীভাবে সৃষ্টি হলো। এই কথা থেকেই হযরত আবু বকর (রা.)-এর মাঝে এই বিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছিল যে, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন খোদা তা'লার পক্ষ থেকেই আমি খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছি আর আমার ওপরই সকল কাজের দায়িত্ব। অতএব আমার জন্য আবশ্যক হলো, মোকাবিলা করার জন্য দণ্ডায়মান হওয়া, সফলতা দেয়া বা না দেয়া আল্লাহ্ তা'লার হাতে। তিনি যদি সফলতা দিতে চান তাহলে তা দান করবেন আর যদি না দিতে চান তাহলে পুরো সৈন্যবাহিনী মিলেও (আমাকে) সফল করতে পারবে না।

হযরত আবু বকর (রা.)-এর সিদ্ধান্তের কত অসাধারণ ফলাফল প্রকাশিত হয়েছিল– এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন যে,

হযরত আবু বকর (রা.) সাহাবীদের মতের বিপরীতে হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.)-কে সৈন্যবাহিনীসহ মু'তার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। অতএব চল্লিশ দিন পর এ বাহিনী নিজ কার্য সমাধা করে বিজয়ীবেশে মদিনায় ফিরে আসে আর সবাই স্বচক্ষে খোদা তা'লার সাহায্য এবং বিজয় অবতীর্ণ হতে দেখে নেয়। এই অভিযানের পর হযরত আবু বকর (রা.) নবুয়্যতের মিথ্যা দাবিদারদের সৃষ্ট নৈরাজ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং এই নৈরাজ্য এমনভাবে দমন করেন যে, একে একদম পিষে ফেলেন, যার ফলে এই নৈরাজ্য পুরোপুরি ধূলিসাৎ হয়ে যায়। পরবর্তীতে মুরতাদদেরও একই অবস্থা হয়। বড় বড় সাহাবীরাও হযরত আবু বকর (রা.)-এর সাথে মতোবিরোধ করেন এবং বলেন, যেসব লোক তৌহীদ ও রিসালাতের স্বীকৃতি প্রদান করে এবং শুধু যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায় তাদের বিরুদ্ধে কীভাবে তরবারি উঠানো সম্ভব? কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) অত্যন্ত সাহসিকতা ও বীরত্ব প্রদর্শন করে বলেন, আজ যদি যাকাত না দেয়ার অনুমতি দেয়া হয় তাহলে মানুষ ধীরে ধীরে নামায এবং রোযাও ছেড়ে দিবে আর ইসলাম কেবল নামসর্বস্ব রয়ে যাবে। মোটকথা এমন অবস্থায় হযরত আবু বকর (রা.) যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী লোকদের মোকাবিলা করেন আর এর ফলাফল যা দাঁড়িয়েছিল তা হলো– এক্ষেত্রেও তিনি বিজয় ও ঐশী সাহায্য প্রাপ্ত হন এবং সমস্ত বিভ্রান্ত লোক সঠিক পথে ফিরে আসে।

এই ধারা এখনও চলমান রয়েছে, ইনশাআল্লাহ্ ভবিষ্যতেও এ বিষয়ে আলোচনা করব। যেভাবে আমি ইদানীং অনবরত আহবান জানিয়ে আসছি, বিশ্ব-পরিস্থিতির জন্য বেশি বেশি

দোয়া অব্যাহত রাখুন এবং এ ক্ষেত্রে দুর্বলতা প্রদর্শন করবেন না। বিশেষভাবে এ দোয়া করুন যে, জগদ্বাসী যেন তাদের সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে পারে, পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার এটিই একমাত্র মাধ্যম। আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করুন এবং আমাদের দোয়াসমূহ গ্রহণ করুন, আমীন।

এখন আমি একজন প্রয়াত ব্যক্তিরও স্মৃতিচারণ করব এবং জুমুআর নামাযের পর (গায়েবানা) জানাযা পড়াব। তিনি হলেন, শ্রদ্ধেয় মওলানা মুবারক নযীর সাহেব। তিনি জামেয়া আহমদীয়া কানাডার প্রিন্সিপাল ছিলেন এবং মুবাল্লেগ ইনচার্জও ছিলেন। গত ০৮ মার্চ তারিখে তিনি ৮৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি ওসীয়্যতকারী ছিলেন। অত্যন্ত নিঃস্বার্থ, আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ ভরসাকারী, দোয়ায় অভ্যস্ত এবং অল্পেতুষ্ট মানুষ ছিলেন। নিতান্তই দরবেশ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তাকে দেখলে সর্বদাই আমার মাঝে সত্যিকার বুযুর্গ দেখার অনুভূতি জাগ্রত হতো। তার পারিবারিক পরিচয় দিতে গেলে বলতে হয়– তিনি জামা'তের সফল মুবাল্লেগ মওলানা নযীর আহমদ আলী সাহেব এবং শ্রদ্ধেয়া আমেনা বেগম সাহেবার দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন। তার পরিবারে আহমদীয়াতের প্রবেশ ঘটে তার দাদা হযরত বাবু ফকীর আলী সাহেব (রা.)-এর মাধ্যমে। তিনি (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছিলেন এবং পরবর্তীতে কাদিয়ানের প্রথম স্টেশন মাস্টার নিযুক্ত হয়েছিলেন। কাদিয়ানে তার দাদার বাড়িও ছিল আর সেটি ফকীর মঞ্জিল নামে পরিচিত ছিল। মওলানা মুবারক নযীর সাহেবের পিতা হযরত মওলানা নযীর আহমদ আলী সাহেবের হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর নির্দেশ অনুসারে ১৯২৯ সনে প্রথমে ঘানাতে দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য হয় এবং পরবর্তীতে তার নিযুক্তি হয় সিয়েরা লিওনে। ১৯৪৩ সনে তার পিতা হযরত মওলানা নাযীর আহমদ আলী সাহেব সিয়েরা লিওন ফিরে যাচ্ছিলেন তখন মুবারক নাযীর সাহেবও তার পিতামাতার সাথে সিয়েরা লিওনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এই সফরে একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনাও ঘটেছিল আর মওলানা মুবারক নযীর সাহেব এর উল্লেখ করেছেন। সামুদ্রিক জাহাজে এটি তিন মাস দীর্ঘ একটি সফর ছিল। তখন তার, অর্থাৎ মুবারক নযীর সাহেবের বয়স ছিল ১১ বছর। সফরের মাঝে তিনি অসুস্থ হয়ে যান এবং রোগের প্রকোপ এমন ছিল যে, মনে হচ্ছিল এখন আর বাঁচবেন না। সামুদ্রিক জাহাজের সফর ছিল, যেমনটি আমি বলেছি। জাহাজে উঠছিলেন বা জাহাজ পরিবর্তন করছিলেন অথবা জাহাজে আরোহণ করছিলেন। এটি জাহাজে উঠার পূর্বের ঘটনা। যাহোক জাহাজে আরোহনের পূর্বে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন আর জাহাজের কর্তৃপক্ষ তার অবস্থা দেখে তার পিতাকে বলেন, আপনার পুত্র তো আধামরা, এর তো প্রাণ যায় যায় অবস্থা। সে যদি সফরে মারা যায় তাহলে আমাদের কাছে লাশ রাখার জন্য কোন হিমাগার নেই, কোন ব্যবস্থা নেই। তাই আপনার এই সন্তানের কারণে আমরা আপনাকে নিয়ে যেতে পারছি না। মওলানা সাহেব পীড়াপীড়ি করে বলেন, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন আর যে কোন মূল্যে আমি এই জাহাজে যাত্রা করব। অতঃপর জাহাজ কর্তৃপক্ষ তাকে একথা লিখে দেয়ার শর্তে জাহাজে বসার অনুমতি দেন যে, তার ছেলে যদি সফরকালীন সময়ে মারা যায় তবে তার লাশ সমুদ্রে ফেলে দেওয়ার অনুমতি থাকবে। জাহাজের ক্যাপ্টেন যখন এই শর্তের কথা বলেন তখন মুবারক নযীর সাহেবের মাতা কাঁদতে আরম্ভ করেন, মর্মাহত হন এবং মওলানা নযীর আলী সাহেবকে বলেন, ছেলের স্বাস্থ্যের এহেন অবস্থায় আমরা অন্য কোন জাহাজে সফর করব। মওলানা নযীর আহমদ সাহেব তার স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, আমি একজন মুবাল্লেগ যাকে হুযূর একটি দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন। আমি জানি না, অন্য জাহাজ আবার কবে পাব? তার স্ত্রীকে তিনি বলেন, তুমি আশ্বস্ত থাক, মুবারকের কিছুই হবে না। একথা বলে তিনি জাহাজের ক্যাপ্টেনকে দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, কোথায় স্বাক্ষর করতে হবে? কাগজ নিয়ে আসুন। পুনরায় তিনি

ক্যাপ্টেনকে বলেন, এই ছেলে যদি মারা যায় তবে তাকে সাগরে ফেলে দেবেন, কিন্তু একইসাথে আমি একথাও বলছি যে, তার কিছুই হবে না। এটি হলো সেই খোদাভরসা যা তার পিতার খোদা তা'লার সত্তায় ছিল। অর্থাৎ আমি একজন ওয়াক্‌ফে জিন্দেগী এবং তাঁর ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছি, এখন আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই আমাকে সাহায্য করবেন এবং আমার পরিবার পরিজনের সুরক্ষা করবেন। অতএব আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সেই ১১ বছরের বালক কেবল জীবিতই ছিল না বরং তিনি ৮৭ বছরের জীবন পেয়েছেন এবং ইসলাম ও আহমদীয়াতের সেবার সৌভাগ্যও লাভ করেছেন। নিজ পিতৃপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণে জীবন উৎসর্গ করেছেন বা এ সৌভাগ্যও লাভ করেছেন এবং ধর্মসেবার ক্ষেত্রে নিজেও খোদাভরসার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

স্নাতক শেষ করার পর সরকারী প্রতিষ্ঠানে তিনি ভালো চাকরিও পেয়েছিলেন, যেখানে তিনি কিছুদিন কাজ করেন। অতঃপর সাময়িকভাবে হলেও ওয়াকফ করুন মর্মে আল ফযলে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর আহ্বান পড়ে তিনি চাকরি থেকে অব্যাহতি নিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর সমীপে সাময়িক ওয়াকফের আবেদন করেন। পরে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর নির্দেশ অনুসারে ১৯৬৩ সালে তিনি সর্বপ্রথম ওয়াক্‌ফে আরযীর জন্য সিয়েরা লিওন চলে যান, যেখানে একটি দীর্ঘ সময় তার পিতা হযরত মওলানা নযীর আলী সাহেবও দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেয়েছিলেন। তার কবরও সেখানে ছিল, অর্থাৎ মৌলভী নযীর আলী সাহেব সেখানেই সমাহিত হয়েছিলেন। সিয়েরা লিওন পৌঁছেই সর্বপ্রথম তিনি তার পিতার কবরে (যিয়ারতের জন্য) উপস্থিত হন। তখন তিনি তার পিতার সেই কথাগুলো স্মরণ করেন যা জনাব মওলানা নযীর আলী সাহেব ২৬ নভেম্বর ১৯৪৫ সালে তার একটি প্রাণোদ্দীপক বক্তৃতায় বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আজ আমরা খোদা তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরে জিহাদ করতে এবং ইসলামকে পশ্চিম আফ্রিকায় বিস্তৃত করার লক্ষ্যে যাচ্ছি। মৃত্যু মানুষের সাথে লেগেই থাকে। আমাদের মধ্যে কেউ মারা গেলে আপনারা মনে রাখবেন, পৃথিবীর দূরদূরান্তের কোন একটি অঞ্চলে আহমদীয়াতের মালিকানায় সামান্য এক টুকরো জমি রয়েছে। আহমদী যুবকদের জন্য আবশ্যিক দায়িত্ব হলে, সেখানে পৌঁছা এবং সেই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করা যে লক্ষ্যে আমরা সেই ভূখণ্ডকে কবররূপে দখল করেছি। একথার অর্থ হলো, আহমদীয়াতের সামান্য একটু জমি রয়েছে যেখানে একজন আহমদী মুবাল্লেগের কবর বিদ্যমান আর এই কবরের কারণে সেই জমির ওপর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। সুতরাং আমাদের কবরগুলোর পক্ষ থেকে এই দাবি থাকবে যে, নিজ সন্তানসন্ততিকে এমনভাবে প্রশিক্ষণ দিন যেন তারা তা পূর্ণ করে, যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাদের জীবন অতিবাহিত হয়েছে। অতএব তার শ্রদ্ধেয় পিতার ওসীয়্যত অনুসারে মওলানা মুবারক নযীর সাহেব সেখানে যান এবং পিতার কবরের সামনে উপস্থিত হয়ে বলেন, লাব্বায়েক! আমি উপস্থিত আর আপনার আহ্বানে সাড়া দেবার জন্য আমি এসেছি। সিয়েরা লিওনের বিভিন্ন স্থানে তিনি দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য লাভ করেন। এরপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর নির্দেশে ১৯৮৫ সালে তিনি পাকিস্তান ফেরত আসেন। ১৯৮৫ সালে আফ্রিকা থেকে ফেরত আসার পর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর সমীপে তিনি অস্থায়ী জীবন উৎসর্গের পরিবর্তে স্থায়ীভাবে জীবন উৎসর্গের আবেদন করেন, যা হুযূর গ্রহণ করেন। এরপর পুনরায় ১৯৮৮ সালে তাকে মুবাল্লেগ হিসেবে কানাডা প্রেরণ করা হয়; যেখানে তিনি বিভিন্ন স্থানে মুবাল্লেগ হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। ২০০৩ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর সদয় অনুমোদনক্রমে জামেয়া আহমদীয়া কানাডা চালু করার সিদ্ধান্ত হয় এবং প্রিন্সিপাল হিসেবে তাকে নিযুক্তও করা হয়েছিল, কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় জামেয়া চালু হয় নি। পরবর্তীতে আমার যুগে জামেয়া আরম্ভ হয় আর আমিও হযরত খলীফা রাবে (রাহে.) যাকে মনোনীত করেছিলেন তাকে বহাল রাখার

সিদ্ধান্ত দেই যে, তিনিই প্রিন্সিপাল হবেন। যাহোক তিনি জামেয়া আহমদীয়া কানাডার প্রথম প্রিন্সিপাল ছিলেন। এরপর ২০০৯ সাল পর্যন্ত তিনি প্রিন্সিপাল হিসেবে জামেয়াতে দায়িত্ব পালন করেন। ২০১০ সালে আমি তাকে কানাডার মিশনারী ইনচার্জ হিসেবে নিযুক্ত করি এবং ২০১৮ সাল পর্যন্ত তিনি নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি সর্বমোট ৫৯ বছর দায়িত্ব পালন করেছেন। তার অস্থায়ী ওয়াক্‌ফও স্থায়ী ওয়াক্‌ফই ছিল। অনুরূপভাবে মওলানা সাহেব কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসেবে বেশ কয়েকটি জলসা এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তার বক্তৃতা আহমদী ও অ-আহমদী সবাই খুব পছন্দ করত। অত্যন্ত প্রভাববিস্তারী বক্তৃতা প্রদান করতেন। শ্রোতামণ্ডলীকে পুরোপুরি নিজের দিকে আকৃষ্ট করে নিতেন। ২০১৬ সালে তিনি আমার প্রতিনিধি হিসেবে গুয়াতেমালায় নূর হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর রাখার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। এছাড়া তার বিভিন্ন তবলীগি প্রবন্ধ কানাডার ন্যাশনাল নিউজ, টরেন্টো স্টার এবং অটোয়া সিটিজেনের মতো পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হতো। মওলানা মুবারক নযীর সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন পুস্তক, যেমন– **তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া** এবং **ফতেহ্ ইসলাম**-এর ইংরেজি অনুবাদ করারও তৌফিক লাভ করেছেন। এছাড়া হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর **গালফ ক্রাইসিস** পুস্তকও তিনি অনুবাদ করেন।

তার স্বজনদের মাঝে তার স্ত্রী আমাতুল হাফিয নাযীর সাহেবা এবং তিন পুত্র ও দুই কন্যা অন্তর্ভুক্ত। যেমনটি আমি বলেছি, তিনি অনেক গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন এবং একজন আদর্শস্থানীয় জীবন উৎসর্গকারী ছিলেন আর মুরব্বীদের জন্য এক বিশেষ দৃষ্টান্ত ছিলেন। তার জীবন ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার এক মূর্ত প্রতীক ছিল। সর্বদা জামা'তের সেবা ও যুগ খলীফার আনুগত্যকে নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন। যেমনটি আমি বলেছি, বক্তৃতা প্রদানের অসাধারণ দক্ষতা রাখতেন, উর্দূ এবং ইংরেজি দুই ভাষাতেই তিনি দক্ষতা রাখতেন। গভীর প্রভাববিস্তারী বক্তৃতা প্রদান করতেন। তার স্ত্রী আমাতুল হাফিয সাহেবা লিখেন, সারা জীবন পরম ধর্মভীরুতা ও খোদাভীতির সাথে অতিবাহিত করেছেন। জামা'তের একেকটি পয়সা বাঁচানোর চেষ্টা করতেন আর অত্যন্ত সাদাসিধে জীবনযাপন করেছেন। সিয়েরা লিওন থেকে চলে আসার পরও সেখানকার অনেক গরীবদুঃখী মানুষকে স্থায়ীভাবে নীরবে সাহায্য করতেন। তিনি বলেন, তিনি সর্বোত্তম ওয়াকফে যিন্দেগী হওয়ার পাশাপাশি সর্বোত্তম স্বামী এবং অত্যন্ত স্নেহশীল পিতাও ছিলেন– আমি এ বিষয়ের সাক্ষী। সর্বদা চিন্তিত থাকতেন যে, জামা'ত আমার জন্য অনেক খরচ করছে, সুতরাং আমি কীভাবে জামা'তের কাজে লাগতে পারি? প্রায়ই এ কথা বলতেন যে, যুগ খলীফার অসন্তুষ্টি আমি কোনভাবেই সহ্য করতে পারব না। তার সন্তানদেরও অভিব্যক্তি রয়েছে। সবাই একথাই লিখেছে যে, আল্লাহ্ তা'লা এবং পরকালের প্রতি আমাদের পিতার দৃঢ় ঈমান ছিল। খিলাফতের আনুগত্য এবং জামা'তের ব্যবস্থাপনার প্রতি দৃঢ় আস্থা ছিল। অধিকন্তু আল্লাহ্ তা'লার ওপর অনেক বেশি ভরসা করতেন। প্রায়ই বলতেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে কখনো পরিত্যাগ করবেন না এবং সর্বদা আমাকে সাহায্য করবেন আর তার সাথে আল্লাহ্ তা'লার আচরণও এমনই ছিল। যখন তিনি মিশনারী ইনচার্জ ছিলেন তখন আমীর সাহেব যেখানেই তাকে প্রেরণ করতেন সেখানেও, এছাড়া অবসর গ্রহণের পরও যখন তার স্বাস্থ্যের অবনতি হয় তখনও মাঝে মাঝে তাকে কাজে লাগানো হতো; তিনি যেখানেই যেতেন আর্থিক কুরবানীর আহ্বান করতেন আর প্রথমে তিনি নিজে অংশ নিতেন তারপর বাকি জামা'তকে অনুপ্রাণিত করতেন। যার কারণে মানুষের ওপর গভীর প্রভাব পড়ত।

তার বড় মেয়ে বলেন, আহমদীয়া খিলাফতের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক রাখার পরামর্শ দিতেন। আমাদের মধ্যে সর্বদা তিনি জামা'তী ব্যবস্থাপনার প্রতি ভালোবাসা ও মর্যাদা সৃষ্টির

চেষ্টা করতেন। তার ইচ্ছা ছিল আমরা যেন সর্বদা খলীফাতুল মসীহ্‌র প্রতিটি নির্দেশের ওপর আমল করি। তিনি বলেন, এমন বৈঠক খুব কমই হতো যেখানে এসব বিষয়ের তাগাদা দিতেন না। যখনই নাতি-নাতনী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী একত্রিত হতো তারা জানত যে, তিনি আমাদেরকে বসিয়ে উপদেশ দিবেন। তার উপদেশে সর্বদা এ বার্তা থাকত যে, আমাদের জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। এ বিষয়টি আমাদের নিশ্চিত করা উচিত যে, আমাদের সম্পর্ক আল্লাহ্ তা'লা ও খিলাফতের সাথে। তিনি বলেন, আমাদেরকে বলতেন, জামা'তের কাজ তো অবশ্যই সম্পন্ন হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। তোমরা যদি জামা'তের সেবা না কর তাহলে আল্লাহ্ তা'লা এর চেয়ে ভালো কাজ করার জন্য অন্য লোকদের নিয়ে আসবেন।

তার কনিষ্ঠ কন্যা একটি ঘটনা লিখেছেন, সিয়েরা লিওনে একটি মসজিদ নির্মাণের সময় শ্রমিকরা যখন মজুরী দাবি করে (নির্মাণ কাজ চলছিল আর টাকা শেষ হয়ে গিয়েছিল) তখন বাবার কাছে দেয়ার মতো কোন অর্থ ছিল না। মওলানা মুবারক নযীর সাহেব তাদেরকে বলেন, আগামীকাল আসুন পারিশ্রমিক দিয়ে দেব। সকালবেলা তিনি, অর্থাৎ মুবারক নযীর সাহেব বাড়ির বাইরে বেরিয়ে দেখেন, শ্রমিকরা সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। কিন্তু তখনও অর্থের কোন সংস্থান হয় নি। ফলে তিনি শ্রমিকদেরকে বলেন, আমার কাছে এখন টাকা নেই; কিন্তু আমি দোয়া করছি, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, ইনশাআল্লাহ্ আল্লাহ্ তা'লা শীঘ্রই ব্যবস্থা করবেন। তিনি বলেন, এরই মধ্যে একটি গাড়ি দ্রুত গতিতে তার কাছে আসে এবং তাকে একটি খাম দেয় যার মধ্যে টাকা ছিল আর তাকে বলে, কোন ব্যক্তি শুনেছিল, আপনি মসজিদ নির্মাণ করছেন, তাই তিনি এ অর্থ পাঠিয়েছেন, এটি রেখে দিন। কে টাকা দিয়েছে– একথা জিজ্ঞেস করার পূর্বেই খাম দিয়ে গাড়িটি দ্রুত চলে যায়। তিনি বলেন, এ বিষয়ে তার বিশ্বাস জন্মে যে, আল্লাহ্ তা'লা তার দোয়া গ্রহণ করেছেন। এভাবে এই অর্থ দিয়ে তিনি শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ করে দেন।

অতএব এটি ছিল আল্লাহ্ তা'লার ওপর তার তাওয়াক্কুল (ভরসা) এবং তার সাথে আল্লাহ্ তা'লার আচরণ। এ ধরনের তাওয়াক্কুল ও তার সাথে আল্লাহ্ তা'লার ব্যবহারের আরো অনেক ঘটনা রয়েছে যা বিভিন্ন লোক লিখেছে, মুরব্বীরাও লিখেছেন। যেমনটি আমি বলেছি, নিশ্চয় তিনি একজন 'সৎকর্মশীল আলেম' ছিলেন। এজন্যই লোকদের ওপর তার বক্তৃতার অনেক প্রভাব পড়ত। কিন্তু খিলাফতের সম্মুখে তিনি ছিলেন পরম বিনয়ী।

আল্লাহ্ তা'লা তার মর্যাদা উন্নীত করুন। তার সন্তানসন্ততি ও বংশধরদের তার পদাঙ্ক অনুসরণকারী করুন। তার সন্তান ও বংশধরদেরকে তার দোয়ার উত্তরাধিকারী করুন। এছাড়া আল্লাহ্ তা'লা ক্রমাগতভাবে জামা'তকেও তার মতো নিঃস্বার্থ সেবক দান করতে থাকুন। বিশেষভাবে কানাডা জামেয়া থেকে যারা পাশ করেছে এমন মুরব্বীরা কীভাবে তিনি তরবিয়্যত করতেন, কীভাবে তবলীগ করা শিখিয়েছেন, কীভাবে নৈতিক শিক্ষা দিয়েছেন, কীভাবে ধর্ম শিখিয়েছেন, তার সাথে সম্পর্কযুক্ত অনেক ঘটনা লিখেছেন। যাহোক সেসব মুরব্বী অনেক কল্যাণ লাভ করেছেন। তাদের মনে রাখতে হবে যে, এসব ঘটনা কেবল স্মরণ রাখা বা বর্ণনা করার জন্য যেন না হয়, বরং এসব মুরব্বীকেও এসবের ব্যবহারিক চিত্র হওয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও তৌফিক দান করুন।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)